ডিসেম্বর ২০১৪, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন এম. খালিদ খান। তদানীন্তন স্টেট ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছিলেন ১৯৫২ সালে। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন সক্রিয়ভাবে। মুজিব নগরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর দীর্ঘ বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে কখনো আপোষ করেননি অন্যায়ের সাথে। একজন মেধাবী, দক্ষ, সৎ সর্বোপরি নিভৃতচারী এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকার দেশের স্বার্থে তাঁর মেধা ব্যয় করেছেন অকাতরে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস রচনা বিষয়ক সম্পাদনা কমিটি ও গবেষণা টিমের সদস্য ড. আবুল কালাম আজাদ, এফ.এম. মোকাম্মেল হক, গোপাল চন্দ্র দাস এবং জোবায়দা আফরোজের সঙ্গে গত ২১ নভেম্বর ২০১৪ তিনি নানা বিষয় নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্যও একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। আলাপচারিতার সময় তাঁর সহধর্মিণী আতিয়া ফারহাত বেগম প্রদান করেছেন সার্বিক সহযোগিতা, ক্ষয়হীন আনন্দ চেতনার উৎসগুলোকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছেন। জীবনস্রোতের মুহূর্তগুলোকে ধরতে প্রচার বিমুখ এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকার চলে গিয়েছেন কখনও অতীতে, কখনও ফিরে এসেছেন বর্তমানে। মার্জিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী এম. খালিদ খানের সাক্ষাৎকারের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

‘

বাংলাদেশ ব্যাংকের যা কিছু সাফল্য তা সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা হিসেবে গর্ববোধ করি। আমি আশা করি বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক উন্নতির জন্য সবাই একসাথে কাজ করবেন।

এম. খালিদ খান
প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর

‘ছাত্র জীবন থেকে আমি বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে সক্রিয় ছিলাম’- এম. খালিদ খান

প্রথমেই জানতে চাই আপনার পুরনো দিনগুলোর কথা। কেমন ছিল আপনার চাকরির শুরুর সময়টা ?

আমি চাকরিতে যোগদান করি ১৯৫২ সালে। তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের করাচি অফিসে শুরু হয় আমার কর্মজীবন। আমি প্রথম শ্রেণির অফিসার নিয়োগ পরীক্ষায় পুরো পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় শুরু থেকেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। দীর্ঘ চাকরিজীবনের বড় অংশটা আমি কাটাই ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগে।

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

‘আমার সুখ-দুঃখের সাথী সহধর্মিণী আতিয়া ফারহাত বেগম’

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  ইন্দ্রাণী হক
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি নির্মাণে ঋণ সহায়তায় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, গভর্নর ড. আতিউর রহমানসহ অন্যান্য অতিথি

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ডরমিটরি নির্মাণ করার জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেবে গৃহায়ন তহবিল। এ লক্ষ্যে গৃহায়ন তহবিল ও বিজিএমইএ'র মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তি মোতাবেক মাত্র ২ শতাংশ সুদ হারে বিজিএমইএ'র সদস্যভুক্ত পোশাক কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি নির্মাণে ঋণ নিতে পারবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিল ডরমিটরি নির্মাণ খরচের ৬০ শতাংশ ঋণ হিসেবে দেবে। আর বাকি ৪০ শতাংশ খরচ মালিককে বহন করতে হবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর উপলক্ষে ১১ নভেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও গৃহায়ন তহবিলের উপদেষ্টা ম. মাহফুজুর রহমান ও বিজিএমইএ'র সহসভাপতি (অর্থ) রিয়াজ বিন মাহমুদ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজিএমইএ'র সভাপতি মোঃ আতিকুল ইসলাম। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিজিএমইএ'র কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, আমাদের দেশের গৃহায়নের মান খুব ভালো নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উদ্যোগের ফলে প্রায় ২ কোটি মানুষের আবাসন সমস্যা কমবে। এই উদ্যোগকে একটি মহতী উদ্যোগ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক যে সুযোগ বিজিএমইএকে দিয়েছে তাতে তারা সাড়া দিয়েছে। বিজিএমইএ এই সুযোগ কাজে লাগাবে এবং এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেইসাথে বাংলাদেশে ঋণখেলাপি হওয়ার যে সংস্কৃতি রয়েছে তা থেকে উত্তরণ হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া অর্থমন্ত্রী গৃহায়ন তহবিলের আকার বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রস্তাব বিবেচনা করবেন বলে জানান।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, তৈরি পোশাকশিল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাত আর আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশাল অবদান রাখছে। জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের তুলনায় এখনও গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি সন্তোষজনক নয়। আরেকটি বড় সমস্যা হলো আবাসন সমস্যা। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। এ সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বিজিএমইএ তার সদস্যদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে ঋণগ্রহীতা নির্বাচন করবে এবং গ্রাহকের পক্ষে গ্যারান্টি ইস্যু করবে। গ্রাহক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিজিএমইএ তা পরিশোধে বাধ্য থাকবে। তাই এ ঋণ কর্মসূচির সাফল্য-ব্যর্থতা বিজি-এমইএ'র ওপর নির্ভর করছে।

গভর্নর আরও বলেন, সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৫০টি উপজেলায়, ৫১২টি এনজিও'র মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটেছে। ইতোমধ্যে এমএফআইগুলোকে প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সারাদেশে প্রায় ৬০ হাজার গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি গৃহে গড়ে ৫ জন করে ধরলে উপকারভোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় তিন লক্ষ। এ পর্যন্ত সরকার ১৬১ কোটি টাকা গৃহায়ন তহবিলে যুক্ত করেছে। তহবিলটি ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পরিচালিত। বর্তমানে এর আকার দাঁড়িয়েছে ৩২৭ কোটি টাকা। ইতিপূর্বে এ তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আশুলিয়ায় প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ তলাবিশিষ্ট একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। এতে ৭৪৪ জন দরিদ্র নারী শ্রমিকের আবাসন সুবিধা হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও গৃহায়ন তহবিলের উপদেষ্টা ম. মাহফুজুর রহমান বলেন, দেশের ভূমিহীনদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিল ও বিজিএমইএ'র এই স্মারক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ভবিষ্যতে এই উদ্যোগ সফল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিজিএমইএ'র সভাপতি মোঃ আতিকুল ইসলাম ডরমিটরি স্থাপনে গাজীপুরসহ বিভিন্ন গার্মেন্টস অধ্যুষিত এলাকায় সরকারের খাস জমিগুলো নীতিমালা করে উদ্যোক্তাদের দেয়ার জন্য অর্থমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

ড. আতিউর রহমান 'গুসি পিস প্রাইজ' পদকে ভূষিত

ড. আতিউর রহমান

অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান 'গুসি পিস প্রাইজ ইন্টারন্যাশনাল ২০১৪' পদকে ভূষিত হয়েছেন। ২৬ নভেম্বর ২০১৪ ফিলিপাইনের ম্যানিলায় এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে তিনি এ পদক গ্রহণ করেন। বিশ্বের ১৪টি দেশ- অস্ট্রিয়া, চিন, কঙ্গো, জার্মানি, ভারত, ইরান, ইতালি, জাপান, লিথুনিয়া, নেপাল, নেদারল্যান্ড, ফিলিপাইন, পোল্যান্ড এবং সৌদি আরবের মোট ১৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে শান্তি ও কল্যাণে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখার জন্য এ পদকে ভূষিত করা হয়। গুসি পিস প্রাইজ ফাউন্ডেশন ড. আতিউর রহমানকে গরিবের অর্থনীতিবিদ হিসেবে অভিহিত করেছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ড. আতিউর রহমান মানব উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণপদক (২০১১) সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদকে ভূষিত হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে গভর্নরকে অভিনন্দন

গভর্নর ড. আতিউর রহমান 'গুসি পিস প্রাইজ ইন্টারন্যাশনাল ২০১৪' পদকে ভূষিত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে

বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে গভর্নরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন

সংগঠনের সভাপতি মোঃ নেছার আহাম্মদ ভূঁঞাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি গভর্নরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেই সাথে গরিবের অর্থনীতিবিদ হিসেবে জাতির জন্য এ অভূতপূর্ব ও বিরল সম্মান লাভ করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মুজিব আদর্শের সহকর্মীদের পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দন বার্তা প্রদান করা হয়।

ডেপুটি গভর্নরের মহাত্মা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড অর্জন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী মহাত্মা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ অর্জন করেছেন। মহাত্মা গান্ধী গবেষণা পরিষদ ২ অক্টোবর ২০১৪ জাতিসংঘ ঘোষিত অহিংস দিবসে তাকে এ সম্মাননা প্রদান করে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে ২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে আয়োজিত 'মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলন এবং আজকের বিশ্ব' শীর্ষক আলোচনা সভা ও মহাত্মা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তাকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের

মহাত্মা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন ডেপুটি গভর্নর

চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এন. এ. করিম বিদ্যুৎ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক তথ্য সচিব সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ। উল্লেখ্য, ২০০৭ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধী গবেষণা পরিষদ মহাত্মা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আসছে।

প্রাইজবন্ড ড্রয়ের ফলাফল মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে

এই প্রথমবারের মতো প্রাইজবন্ডের ফলাফল বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েবসাইটের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমেও জানা যাবে। গ্রাহকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে নির্মিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্রাইজবন্ডের সকল ড্রয়ের ফলাফল জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা গুগল প্লে স্টোরের https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcc.prizebond এই লিঙ্ক থেকে অথবা ফোনের প্লে স্টোরে প্রবেশ করে সার্চ অপশনে গিয়ে Bangladesh Prize Bond নামক এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড/ইনস্টল করে প্রাইজবন্ডের সিরিয়াল নম্বর ইনপুটের মাধ্যমে খুব সহজেই ফলাফল দেখে নিতে পারবেন।

উল্লেখ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি নির্মাণ করা হয়েছে। ১০০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ডের ৩৯টি সিরিজ যথা–কক, কখ, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কদ, কন, কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, খক, খখ, খগ, খঘ, খঙ, খচ, খছ, খজ, খঝ, খঞ, খট, খঠ এবং খড এই ড্রয়ের আওতাভুক্ত। প্রতি সিরিজের জন্য ৪৬টি করে ৩৯টি সিরিজের সর্বমোট ১৭৯৪টি পুরস্কার রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড - ২০১৩ অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দের সাথে রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত রেমিটার ও বন্ডে বিনিয়োগকারীগণ

দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ করে অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য শীর্ষ প্রবাসীদেরকে প্রথমবারের মতো সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৩ সালে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য ২০ জন এবং বন্ডে বিনিয়োগ করার জন্য ৪ জন প্রবাসীকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে ২৩ নভেম্বর ২০১৪ রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৩' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিবি) এর চেয়ারম্যান ও ইস্টার্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী রেজা ইফতেখার।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, রেমিট্যান্স প্রবাহ আজ শুধু নির্দিষ্ট কিছু দেশের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। ইউরোপ, আমেরিকার দেশগুলো এবং এশিয়ার কিছু দেশ যেমন- জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ায় দক্ষ জনবল রপ্তানি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পুরুষের পাশাপাশি এখন নারীরাও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে কাজ করতে যাচ্ছে। এটি দেশের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। রেমিটারদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ফলে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা স্বাবলম্বী। তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিদেশের মাটিতে সম্মান অর্জন করছেন। এ অর্জন সমগ্র দেশের।

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বলেন, প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি এবং বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীল উৎস। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখার পাশাপাশি এটি দারিদ্র্য নিরসনেও সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি আমদানি অর্থায়ন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি ও লেনদেনের ভারসাম্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অন্যতম অনুঘটক। গত অর্থবছরে ১৪.২৩ বিলিয়ন ডলার ও তার আগের অর্থবছরে ১৪.৪৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা ছিল রেকর্ড পরিমাণ। আর এবছর বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে।

অনুষ্ঠানে রেমিটারদের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান বলেন, এ আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনেক উৎসাহিত হবেন। রেমিটাররা বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে রেমিট্যান্স আওয়ার্ড সম্মাননা প্রদান করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত রেমিটারসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

যারা অ্যাওয়ার্ড পেলেন –

রেমিটার: মাহিউল মোহাম্মদ খান, যুক্তরাজ্য; মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান- সংযুক্ত আরব আমিরাত; মোঃ রেজাউল হাসান- যুক্তরাষ্ট্র ; জাকির হোসেন- কুয়েত; আবুল কালাম- সংযুক্ত আরব আমিরাত; সাইদুর রহমান হাবিব- হংকং; জাফর আহমেদ- সংযুক্ত আরব আমিরাত; মোহাম্মদ এমাদুর রহমান- সংযুক্ত আরব আমিরাত; নাজমুল হোসেন গাজী- কুয়েত; নিজাম মোহাম্মদ মিয়া- যুক্তরাষ্ট্র; এস.এ.কে একরামুজ্জামান- সংযুক্ত আরব আমিরাত; সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম- জার্মানি; আবু তাহের মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্- ফিলিপাইন; ডা. মীর আজমল আলী- যুক্তরাজ্য; ওহিদ মোল্লা- ইতালি; শফি আহমদ চৌধুরী- যুক্তরাজ্য; মোঃ ইমাদুল ইসলাম- কুয়েত; মোঃ মুকিতুর রহমান- অস্ট্রেলিয়া; আহমাদুল আমিন- মালয়েশিয়া; রবিন রহমান- পাপুয়া নিউগিনি।

বন্ডে বিনিয়োগকারী: মোহাম্মদ অলিউর রহমান- সংযুক্ত আরব আমিরাত; মিজান মোহাম্মদ জাহিদ- কানাডা; আব্দুল করিম- সংযুক্ত আরব আমিরাত; মোঃ আক্তার হোসেইন- সংযুক্ত আরব আমিরাত।

ডিএমসিএইচ'র বার্ন ইউনিটে চিকিৎসা সরঞ্জাম হস্তান্তর

বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ডিএমসিএইচ) বার্ন ইউনিটে জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ে ৫০ লক্ষ টাকার অনুদান দেয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে ৯ নভেম্বর ২০১৪ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতীকি চিকিৎসা সরঞ্জাম হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতীকি সরঞ্জাম হস্তান্তর করেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমানসহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, যে কোন দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্ব যে অপরিসীম তা রানা প্লাজা ধসের পরপরই অনুধাবন করে রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান হয়েও বাংলাদেশ ব্যাংক 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' নামে একটি সিএসআর তহবিল গঠন করে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবছরের মুনাফা হতে ৫ কোটি টাকা এ তহবিলে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এ তহবিল হতে অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ইতোমধ্যে আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হয়েছে। আর এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটকে ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

গভর্নর আরও বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণসহ ১৪টি প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের সহায়তার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এছাড়া দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সিএসআরের মাধ্যমে আরও ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে এবং মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রমের দিকে আগামী দিনে অধিক যত্নশীল ও মনোযোগী হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ড. আতিউর রহমান বার্ন ইউনিটের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জাম হস্তান্তর করছেন

গভর্নর ড. আতিউর রহমান সকল আয়োজনের জন্য অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আন্তর্জাতিক স্টাডি ভিজিট প্রোগ্রাম

বাংলাদেশে মাইক্রো এমএসএমই (MSME- Micro Small and Medium Enterprise) খাতে ক্ষুদ্র অর্থায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও অর্জন সরেজমিনে দেখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী ও ফিলিপাইনের APRACA-CENTRAB যৌথভাবে ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর ২০১৪ মেয়াদে একটি আন্তর্জাতিক স্টাডি ভিজিট প্রোগ্রামের আয়োজন করে। APRACA ভুক্ত দেশসমূহের বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিসহ দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তারা বাংলাদেশের নানান মাইক্রো এসএমই প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত এ ভিজিট প্রোগ্রামে অংশ নেন। এ উপলক্ষে ১৬ নভেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শেখ আজিজুল হক। এছাড়া অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও নাজনীন সুলতানাসহ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশের মাইক্রো এসএমই ও কৃষিখাতের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণকারীরা তাদের দেশে মাইক্রো এসএমই খাত নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ভিজিট প্রোগ্রামের সমাপনী এবং সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান ২০ নভেম্বর ২০১৪ ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং বিবিটিএ'র নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটি গভর্নর প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। স্টাডি ভিজিটে প্রশিক্ষণার্থীগণ এক্সিম ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন, এমআরএ, ডব্লিউইএবি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিজিট করেন।

গভর্নর ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়নে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গভর্নর

বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ মুক্তিযুদ্ধ

বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে সদা জাগ্রত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাঙালির ঐতিহ্য ও অহঙ্কারের প্রতীক। তাই দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে সমুন্নত রাখতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে অর্থ প্রদান করেছে, তা নিঃসন্দেহে কিছুটা হলেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়নে সহায়ক হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। ২৫ অক্টোবর ২০১৪ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী।

ড. আতিউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়নে চেক হস্তান্তর করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশন (বিএলএফসিএ) এর চেয়ারম্যান আসাদ খান ও ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স প্রোমোটার্স অ্যাসোসিয়েশন (এফআইপিএ) এর চেয়ারম্যান এম মতিউল ইসলাম। এ অনুষ্ঠানে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে এক কোটি ৭২ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর হাতে এই চেক হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে এক মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য দেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিএসআর তহবিল হতে এক কোটি ৭২ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হচ্ছে। এ কাজে মধ্যস্থতা করতে পেরে বাংলাদেশ ব্যাংক যেমন আনন্দিত, তেমনই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে কিছুটা হলেও সহায়ক অবদান রাখতে পেরে ব্যাংক গর্বিত। তিনি বলেন, এর আগে ব্যাংকগুলোও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়নে মোটা অংকের সিএসআর ফান্ড দিয়েছে।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন এবং দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল আমাদের স্বাধীনতা। সেই দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস, স্বাধীনতার গৌরবগাথা ধরে রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিরা নিঃস্বার্থে জাদুঘর নির্মাণের কাজে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে লালন, ধারণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে সাম্য, সংহতির ও জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত করবে এই জাদুঘর।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্মিতব্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবন সম্পর্কে তিনি বলেন, এর আগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যস্থতায় ব্যাংকিং সেক্টর থেকে প্রায় ২৮ কোটি টাকা অনুদান দেয়া হয়েছিল। এই ভবন শুধু একটি জাদুঘরই হবে না, একই সাথে তা হবে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান একটি স্থাপত্য। আগামী দিনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংকট মোকাবেলায় এটি হবে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। ১০০ কোটি টাকার অধিক ব্যয়ে নির্মিত এই ভবন স্থাপত্যশৈলীর কারণে দেশি বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতেও পরিণত হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী তার বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযোদ্ধারাই শুধু অস্ত্র হাতে দেশের জন্য যুদ্ধ করেননি। নিরন্তর তাদের পাশে ছিলেন বাংলার আপামর জনসাধারণ। সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ, ত্যাগ-তিতিক্ষার ফল আমাদের স্বাধীনতা। তাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও জনগণের প্রতিষ্ঠান। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, সহযোগিতায় এই জাদুঘর তৈরি হবে। জনগণের অর্থে, জনগণের মালিকানায় এই জাদুঘর তৈরি হলে জাতির মহান অর্জন স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ ও অর্থবহ হবে। জাদুঘর নির্মাণে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিএলএফসিএ'র চেয়ারম্যান আসাদ খান ও এফআইপিএ'র চেয়ারম্যান এম মতিউল ইসলাম। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও অন্যান্য কর্মকর্তা, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

টাকা জাদুঘরে মুদ্রা উপহার

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ১৩ অক্টোবর ২০১৪ টাকা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এসময় মুদ্রা সংগ্রাহক সৈয়দ রশীদ আলম বেশ কিছু মুদ্রা ও কাগুজে নোট টাকা জাদুঘরের জন্য হস্তান্তর করেন। ডেপুটি গভর্নর এ মুদ্রা ও কাগুজে নোট গ্রহণ করেন এবং সৈয়দ রশীদ আলমকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, সৈয়দ রশীদ আলম এর আগেও টাকা জাদুঘরে মূল্যবান মুদ্রা ও নোট উপহার হিসেবে প্রদান করেছেন।

ব্যাংক ব্যবস্থায় আরটিজিএস বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় আন্তঃব্যাংক লেনদেন দ্রুত ও ঝুঁকিমুক্ত করতে Real Time Gross Settlement বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় Remittance and Payment Systems Infrustructural Development প্রকল্পের আওতায় Real Time Gross Settlement (RTGS) ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। RTGS বাস্তবায়নের জন্য সুইডেনভিত্তিক CMA Small Systems AB কে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। মেসার্স স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম লিঃ বাংলাদেশ CMA-এর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে।

এ লক্ষ্যে ২০ নভেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে একটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও নাজনীন সুলতানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক ও RTGS প্রকল্প পরিচালক শুভঙ্কর সাহা এবং CMA এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এলেক্সি নাজারভ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ড. আতিউর রহমান ও অন্যান্য অতিথি

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, RTGS ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে দেশে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে। এর মাধ্যমে ব্যাংকের গ্রাহকরা Real Time ভিত্তিতে High Value আন্তঃব্যাংক লেনদেনগুলো সম্পন্ন করতে পারবেন। স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেনের পাশাপাশি এ ব্যবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনসমূহ সম্পন্ন করা যাবে। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ এ ব্যবস্থা গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত করা যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে RTGS ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি তফসিলি ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের নির্দেশ দেন।

গভর্নর আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি সক্ষমতা অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় অনেক উন্নত। তবে শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকই নয় অন্য ব্যাংকগুলোর আইটি'র মান উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক সচেষ্ট রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া পেমেন্ট সিস্টেমকে আরও উন্নত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকেও আধুনিক করা হবে বলে গভর্নর জানান। পেমেন্ট সিস্টেম্স ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক কে, এম, আব্দুল ওয়াদুদ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) এর সভাপতি এবং চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

goAML Software এ বিমা কোম্পানিসমূহের নিবন্ধন

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে বিএফআইইউ কর্তৃক বিভিন্ন রিপোর্টিং এজেন্সি হতে Suspicious Transaction Report (STR) গ্রহণ অন্যতম। অন্যান্য রিপোর্টিং এজেন্সির মতো বিমা কোম্পানি হতেও নির্দিষ্ট ছকে STR গৃহীত হচ্ছে। বিএফআইইউ এ লক্ষ্যে ২৬-২৭ অক্টোবর ২০১৪ মেয়াদে বিমা কোম্পানিসমূহের সাথে ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, STR অনলাইনে গ্রহণ এবং বিশ্লেষণের জন্য goAML Software ব্যবহার করা হয়। goAML Software মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) এর একটি প্রয়াস।

ইতোমধ্যে এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সকল তফসিলি ব্যাংক হতে অনলাইনে রিপোর্ট (Cash Transaction Report - CTR, Suspicious Transaction Report - STR) গৃহীত হচ্ছে। এছাড়া অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে STR প্রেরণ করছে। বিমা কোম্পানির সাথে অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহ হতে সহযোগিতা পেলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই সফটওয়্যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব।

ডিজিটাল আইডি কার্ড ব্যবহার আবশ্যিক

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস ও প্রধান কার্যালয়ের সব ভবনে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় ডিজিটাল অ্যাক্সেস কার্ড ব্যবহারের জন্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২ এর ২১ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে জারি করা অফিস নির্দেশের মাধ্যমে ২ নভেম্বর ২০১৪ হতে ডিজিটাল অ্যাক্সেস কার্ড আবশ্যিকভাবে ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে মতিঝিল অফিস ও প্রধান কার্যালয়ের সব ভবন, বিভাগ এবং ফ্লোরে ডিজিটাল অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডিজিটাল অ্যাক্সেস কার্ড (আইডি কার্ড) সরবরাহ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক গবেষণার চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সেমিনার

পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল প্রফেসর নূরুল ইসলামকে চিত্রকর্ম উপহার দিচ্ছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ইকোনমিস্ট ফোরাম (বিইএফ) এর যৌথ উদ্যোগে 'রিফ্লেকশনস অন দি ফার্স্ট বিইএফ কনফারেন্স: চ্যালেঞ্জেস ফেসিং ইকোনমিক রিসার্চ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি সেমিনার ১৫ নভেম্বর ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর এ.কে.এন. আহমেদ মিলনায়তনে দেশের তরুণ গবেষকদের জন্য এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত গবেষণা ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন বলে জানান। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের মান উন্নয়নে প্রচুর পরিমাণে গবেষণা, সার্ভে ও উচ্চতর শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর গবেষণার জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। গভর্নর ড. আতিউর রহমান উচ্চতর গবেষণায় এগিয়ে আসার জন্য তরুণদের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, বিশ্বমন্দার সময়েও বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছয় শতাংশের ওপরে ছিল। একই সাথে গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রফেসর ড. নূরুল ইসলাম মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশে গবেষণার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও দেশের সমসাময়িক উন্নয়ন সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, রেমিট্যান্স, তৈরি পোশাক খাত, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ অর্থনীতির নানা দিকের ওপর আলোকপাত করেন। এছাড়া গবেষণা ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্যের স্বল্পতা রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল বলেন, আগামী সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গবেষণার জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করা হবে। এছাড়া দেশের করপোরেট গবেষণা বাড়াতে তাদের কর অব্যাহত সুবিধা দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তরুণ কর্মকর্তা, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তরুণ গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী ছাড়াও অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও দেশের তরুণ অর্থনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শিশুশিল্পীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঈদ-উল-ফিতর (২০১৪ সাল) এবং নববর্ষের (১৪২১ বঙ্গাব্দ) শুভেচ্ছা কার্ড মুদ্রণের জন্য নির্বাচিত চিত্রকর্মের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুশিল্পীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৮ অক্টোবর ২০১৪ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিল্পীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সভাপতিত্ব করেন হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান শিশুশিল্পীদের পুরস্কার প্রদান করেন

গভর্নর ড. আতিউর রহমান অনুষ্ঠানে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যপরিধি ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। ব্যাংক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের আঙ্গিকেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আমরা দিন দিন মানবিক ব্যাংকিংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ব্যাংক আয়োজিত এ চিত্রকর্ম প্রতিযোগিতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি বৃহৎ বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবার গড়ে উঠছে।

উল্লেখ্য, ঈদ-উল-ফিতর এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড মুদ্রণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানের নিকট চিত্রকর্ম আহ্বান করা হয়। এ বিষয়ে গঠিত নির্বাচক কমিটি নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড মুদ্রণের জন্য একটি চিত্রকর্ম নির্বাচন করে এবং সান্ত্বনা পুরস্কারের জন্য কয়েকজন শিল্পীকে মনোনীত করে। প্রধান কার্যালয়ের সিএসডি-১ বিভাগের সহকারী পরিচালক আব্দুল আউয়ালের কন্যা নীলিমা আফরোজ (ঐশী) এর চিত্রকর্মটি নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ডের জন্য নির্বাচিত হয়। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্ষুদে শিল্পীদের অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা অফিস

নির্বাহী পরিচালককে সংবর্ধনা প্রদান

খুলনা অফিসে নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিনের সম্মানে ২৬ অক্টোবর ২০১৪ এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অফিসের মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। সভাপতিত্ব করেন উপমহাব্যবস্থাপক এস, এম, হাসান রেজা। সংবর্ধনা সভায় অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে নির্বাহী পরিচালককে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সংবর্ধিত অতিথির ভাষণে নির্বাহী পরিচালক বলেন, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্ম পরিবেশেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। এসব পরিবর্তনকে আত্মস্থ করার পাশাপাশি তিনি দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সকলকে তৎপর ও আন্তরিক হবার আহ্বান জানান।

নির্বাহী পরিচালককে খুলনা অফিসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়

এছাড়া স্থানীয় ব্যাংকার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ক্লাবের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি মহাঃ নাজিমুদ্দিনের সম্মানে ২৯ অক্টোবর ২০১৪ একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রধানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংক ক্লাব কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, খুলনার নবনির্বাচিত কমিটি ৫ নভেম্বর ২০১৪ ক্লাবের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২২ অক্টোবর ২০১৪ অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী নির্বাচনে কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৯টি পদের মধ্যে সবুজ দল সমর্থিত 'মনজুর-রুহুল আমিন-হাজারী' পরিষদ ১৬টি পদে এবং নীল-হলুদ ঐক্য পরিষদ ৩টি পদে জয়লাভ করে। দায়িত্ব গ্রহণের পর নবনির্বাচিত কমিটি অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন এবং মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্রের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে।

সাক্ষাৎকালে অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে ক্লাবের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে নির্বাহী পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। ক্লাবের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যও তারা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন।

খুলনায় স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ক প্রচার অনুষ্ঠান

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ব্যাংকিং হিসাব বিষয়ে সচেতন করে ব্যাংক হিসাব খোলার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় নগরীর সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণে ২৯ অক্টোবর ২০১৪ অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন

হয় স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ক প্রচার অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। নির্বাহী পরিচালক স্কুলের ছাত্রীদের স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন মহিয়সী নারীর জীবনী তুলে ধরে, বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, খুলনার আঞ্চলিক প্রধান ও উপমহাব্যবস্থাপক এ.টি.এম. মোতাব্বের।

বরিশাল অফিস

মত বিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসে ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম (ISS) সফট্ওয়্যারের ব্যবহার বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা ৯ নভেম্বর

নির্বাহী পরিচালক সভায় বক্তব্য রাখছেন

২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম এবং মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী উপস্থিত ছিলেন। সফট্ওয়্যারের সাথে পরিচিতিকরণ,পরিদর্শন কার্যক্রমের সার্বিক মনোন্নয়ন ও পরিদর্শন কলা-কৌশল সম্পর্কে যথাযথ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়। ISS সম্পর্কিত সেশনটি পরিচালনা করেন প্রধান কার্যালয়ের উপ পরিচালক মোঃ আতিক। সভায় বরিশাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকগণ সহ পরিদর্শন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম অফিস

ব্যাংক কলোনি স্কুলের শিক্ষকদের বিদায় অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিদায় অনুষ্ঠান সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আলম, মোসাম্মৎ জোহরা ফেন্সী মাহমুদা এবং মোহাম্মদ আবুল কালাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী পরিচালক বিদায়ী শিক্ষকদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন

চ্যাম্পিয়ন ফুটবল দলকে সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃঅফিস গভর্নর'স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৪ এ চট্টগ্রাম অফিস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড়দের সম্মানে ৫ নভেম্বর ২০১৪ চট্টগ্রাম অফিসে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার বিজয়ী খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান। দলের সকলের প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী পরিচালকের সাথে চ্যাম্পিয়ন চট্টগ্রাম দল

রাজশাহী অফিস

এসএমই বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে জাইকা সহায়তাপুষ্ট ফিনান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস প্রকল্পের আওতায় একটি সেমিনার ২২ অক্টোবর ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেমিনারের উদ্বোধন করেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া এবং সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ রবিউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড এসপি-ডি'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সেমিনারে উপস্থিত থেকে প্রজেক্টটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এফএসপিডিএসএমই'র (FSPDSME) কনসালটেন্ট তাকিও মাতসুযাওয়া। এ ছাড়াও, সেমিনারে জাইকা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবশ্যক পরিবেশ ছাড়পত্র বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সেমিনারে স্থানীয় এসএমই উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সর্বমোট ৫০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক Money and Banking Data Reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী অফিসের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম। কোর্সের সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র উপমহাব্যবস্থাপক মাহফুজা খানম। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৪০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ অফিস

নতুন ভবনে ময়মনসিংহ অফিসের কার্যক্রম শুরু

ময়মনসিংহ শহরের ২৯, দুর্গাবাড়ি রোডস্থ হৃদয় টাওয়ারে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এ অফিসে ৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মনিটরিংসহ নানাবিধ আর্থিক ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই হৃদয় টাওয়ারের ভাড়া করা ভবন অপর্যাপ্ত ছিল। অফিসের এ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ৬৫, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ রোডের মোমেন টাওয়ারে তিনটি ফ্লোর ভাড়া নেয়া হয়। এ ভবনে অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ ও ২, কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে শহরের হৃদয় টাওয়ার ও মোমেন টাওয়ারের সমন্বয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসের সমগ্র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মালনিছড়া
বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান

মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

> *চা বাগানগুলো পাহাড় থেকে ঢালু হয়ে ছড়িয়ে গেছে সমতলে। চা বাগানের মাঝ দিয়ে পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোটবড় নালা করে দেওয়া আছে। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে ছড়া বলা হয়। ছড়াগুলো সর্পিলভাবে এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূর থেকে দূরান্তে।*

বলা হয় ৩৬০ আউলিয়া আর দু'টি পাতাসহ একটি কুঁড়ির দেশ সিলেট। দীর্ঘ প্রায় আট বছর বন্ধ থাকার পর গত ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৪ সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃঅফিস গভর্নর'স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৪। এ টুর্নামেন্টের ছবি তোলার জন্য ২৮ তারিখ রাতে ঢাকার কমলাপুরের বাস কাউন্টার থেকে বাসে চেপে সিলেটের উদ্দেশে রওনা হলাম। হেমন্তশেষে হালকা শীত শীত আবহাওয়ায় ভোর সাড়ে চারটার দিকে পৌঁছে গেলাম ছিমছাম সিলেট শহরের হুমায়ুন চত্বরে। যখন পৌঁছলাম তখনও ভোরের আলো ফোটেনি আর ফজরের আজানও হয়নি। বাস কাউন্টার থেকে পরামর্শ দিল আলো না ফোটা পর্যন্ত কাউন্টারে বসতে। ব্যাংকের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফি করার সুবাদে আমাকে প্রায়ই দেশের নানা প্রান্তে যেতে হয়। তাই এ জায়গাগুলো একটু ঘুরে দেখারও সুযোগ পেয়ে যাই। যাহোক আগেই সিলেটের বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনির ডরমেটরিতে আমার থাকার জায়গা ঠিক করা ছিল। সকাল ছয়টায় ডরমেটরিতে পৌঁছে যাই। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের ক্লান্তি কাটাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সকাল সকাল সিলেট পুলিশ লাইন মাঠে হাজির হই। সেখানেই উদ্বোধন করা হয় বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃঅফিস গভর্নর'স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রথম দিনে চারটি ইভেন্ট শেষ হতে হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাই সেদিন আর বেড়ানোর সুযোগ হলো না। পরদিন বেলা থাকতেই খেলাগুলো শেষ হয়ে যাওয়ায় বেড়ানোর জন্য বেশ খানিকটা সময় পেয়ে গেলাম।

অনেক দিন থেকেই মনের ভিতর সুপ্ত একটা ইচ্ছে ছিল, কখনো সিলেটে যাওয়ার সুযোগ হলে বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান মালনিছড়া ঘুরে দেখব। আর আজকে সেই সুযোগ ও সময় দুটোই পেয়ে গেলাম। আমি আর আমার সহকর্মী বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের রফিক ভাই সিলেট শহরের রিকাবি বাজার থেকে রিক্সায় চেপে প্রায় ২৫ মিনিটে পৌঁছে যাই লাক্কাতুরা চা বাগানে। এখানে অনেকগুলো চা বাগান রয়েছে। বাগানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো আমাদের দেশের প্রথম চা বাগান মালনিছড়া। বাগানটি ১৮৫৪ সালে রবার্ট ব্রুসের হাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্থানীয়দের কাছে পুরো এলাকাটি লাক্কাতুরা চা বাগান নামে পরিচিত। রাস্তার পাশে একটি নামফলক (Malnicherra Estd. 1854) চিহ্নিত করা আছে। সুন্দর আঁকাবাঁকা রাস্তা আর সবুজ পাহাড়ের চা বাগান, দুইয়ে মিলে এক অন্য রকম পরিবেশ। এই জায়গায় এলে যে কারোরই প্রাণ জুড়াবে এক নিমেষেই। চা বাগানের চারপাশ বিভিন্ন রকমের বেড়া দিয়ে

সুরক্ষিত করা আছে যাতে বাইরের কোনকিছু চা বাগানের কোন ক্ষতি করতে না পারে। আমরা বাগানের ভেতর যখন প্রবেশ করি তখন দেখলাম কয়েকজন মালি অলস সময় কাটাচ্ছে। আমাদেরকে দেখে তারা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। চা বাগান ঘুরে দেখব এটা শোনার পর মালিরা আমাদের গাইড হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে জানায় বাগানের কাজের ফাঁকে বাকি সময়টা তারা পর্যটকদের গাইডের কাজ করে। আর গাইড ছাড়া বাগানের ভেতরে পর্যটকদের প্রবেশে মালিকের নিষেধ রয়েছে। কারণ গাইড সাথে থাকলে বাগান সুন্দর থাকে আর পর্যটকরাও নিরাপদে পুরো জায়গাটি ঘুরে দেখতে পারে। নাহলে বিশাল বড় বাগানে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

চা বাগানটির পুরো এলাকার আয়তন প্রায় এক লক্ষ হেক্টর। আর হঠাৎ কোন ব্যক্তির পক্ষে এ বাগানে ঢুকে আবার পথ ঠিক রেখে বের হয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। বাগানের ভেতরের চারপাশ দেখতে প্রায় একই রকম লাগে। গাইডদের মধ্যে একজন দিপু আমাদের চা বাগান, রাবার বাগান ও কমলা বাগান দেখাবে বলে জানায়। সে রাবার বাগানের শ্রমিকের কাজ করে, তাই পুরো এলাকাটি তার ভালো করে চেনা। দিপু প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় রাবার বাগানে রাবার গাছ কাটা ও তা থেকে কষ সংগ্রহের কাজ করে। ভোর পাঁচটা থেকে সকাল আটটার মধ্যে তাকে এই কাজ সম্পন্ন করতে হয়। কারণ বেলা বাড়লে সূর্যের আলোর সাথে সাথে তাপও বাড়ে। তাপ বাড়লে রাবার শুকিয়ে যায় আর শুকনো রাবার ব্যবহার উপযোগী হয়না। আমরা সব গাছেই রাবার শুকনো অবস্থায় দেখতে পাই। হাত দিয়ে টেনে পুরো রাবারটি তুলে ফেলা যায়। রাবার গাছের বীজগুলো দেখতে ছোট ছোট, অনেকটা পাখির ডিমের মতো ছোপ ছোপ রঙের। আমি উৎসাহী হয়ে কতগুলো বীজ কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রেখে দেই।

গাছ কেটে রাবার সংগ্রহ পদ্ধতি

চা বাগানের ভিতরে ছোট ছোট ঘর তুলে চা শ্রমিকরা বসবাস করে। বাগানের মালিক তাদের থাকার এ ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এতে দুই পক্ষই লাভবান হয় বলে জানায় শ্রমিকরা। বাগান মালিকের আলাদা করে পাহারাদার রাখার প্রয়োজন হয় না, আর শ্রমিকদেরও থাকার জন্য আলাদা খরচের চিন্তা করতে হয়না। কিন্তু তাদের এ থাকার জায়গাটি অস্থায়ী আর খুবই ছোট। কোনরকম মাথা গুঁজে থাকা যায়। আর পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে এত অল্প জায়গায় থাকা তাদের জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে যায়। চা বাগানের ভেতরে তাদের এই থাকার জায়গার পাশাপাশি সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অর্থাৎ চাল-ডালের ছোট ছোট দোকানও আছে। চা বাগানগুলো পাহাড় থেকে ঢালু হয়ে ছড়িয়ে গেছে সমতলে। বাগানের মাঝ দিয়ে পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোটবড় নালা করে দেওয়া আছে। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে ছড়া বলা হয়। ছড়াগুলো সর্পিলভাবে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে দূর থেকে দূরান্তে। আর তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ পানির প্রবাহ। সেই স্বচ্ছ পানির ভেতর দিয়ে দেখা যায় নিচে ছড়িয়ে থাকা সোনালি বালুর আস্তরণ। পানি জমতে পারেনা এরকম উঁচু স্থানে চা গাছ জন্মায়। এ কারণেই চা বাগানগুলো তৈরি করা হয় টিলার উপরে। চা বাগান থেকে পাতা সংগ্রহ করার জন্য রয়েছে সরু পায়ে চলার পথ। এর পাশাপাশি যানবাহন চলাচলের জন্য আছে চওড়া রাস্তা। টিলা থেকে সংগ্রহ করা চা পাতা এ পথেই নিয়ে যাওয়া হয় কারখানাতে।

আমরা শীতের শুরুতে গিয়েছি তাই চা পাতা সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি দেখার সুযোগ হয়নি। শীতের আগমনের সাথে সাথেই চা গাছে পাতা জন্মানো কমে যায়। তাই তখন চা উৎপাদনও কমে যায়। তবে চা পাতা সংগ্রহ করে কারখানায় নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখার সুযোগ হয়েছে। অনেক পাতা সংগ্রহ করে একসাথে ট্রাক্টরে করে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। চা বাগানের সবুজ সতেজ মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গিয়েছি তা আমরা বুঝতেই পারিনি। পাহাড়ের উপরে চা বাগানের অন্য রকম দৃশ্য। চারিদিক সবুজ আর সবুজ। ছোট ছোট চা গাছগুলোকে ছায়া দিচ্ছে বড় বড় গাছ। চা বাগানের মাঝে মাঝে এ গাছগুলো রোপণ করা হয়েছে চা গাছগুলোকে ছায়া দেয়ার জন্য। এগুলোকে বলা হয় শেড ট্রি। এই চা বাগানের ভেতর থেকে বিখ্যাত সিলেট স্টেডিয়াম দেখা যায়। পাহাড়ের ওপর অতিথিদের থাকার জন্য আছে সুন্দর একটি ডাকবাংলো।

পাহাড়ের এক পাশে কমলা বাগান। বাগানের গাছগুলোতে কমলার কুঁড়ি ধরতে শুরু করেছে। এখানকার কমলাগুলো একটু অন্যরকম। কেমন যেন টক-মিষ্টি মেশানো ঝাঁঝালো স্বাদের। কমলাবাগান পার হয়ে চা বাগানের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে নিচে নেমে এসে আমরা ফেরার পথ ধরি। গাইড দিপু আমাদের অন্য রাস্তা দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসে যাতে আমরা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বিমানবন্দরে যাওয়ার রাস্তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি। অবশেষে দিপু আমাদেরকে তার বাড়ি নিয়ে যায়। সেখান থেকে আমরা চা পাতা সংগ্রহ করি ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। দেশের প্রথম চা বাগানে বেড়ানোর স্মৃতি আর চা পাতা নিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

■*লেখক: অফিসার, ডিসিপি, প্র.কা.*

কিশোর হৃদয়ে ৭১

মোঃ মাছুম পাটোয়ারী

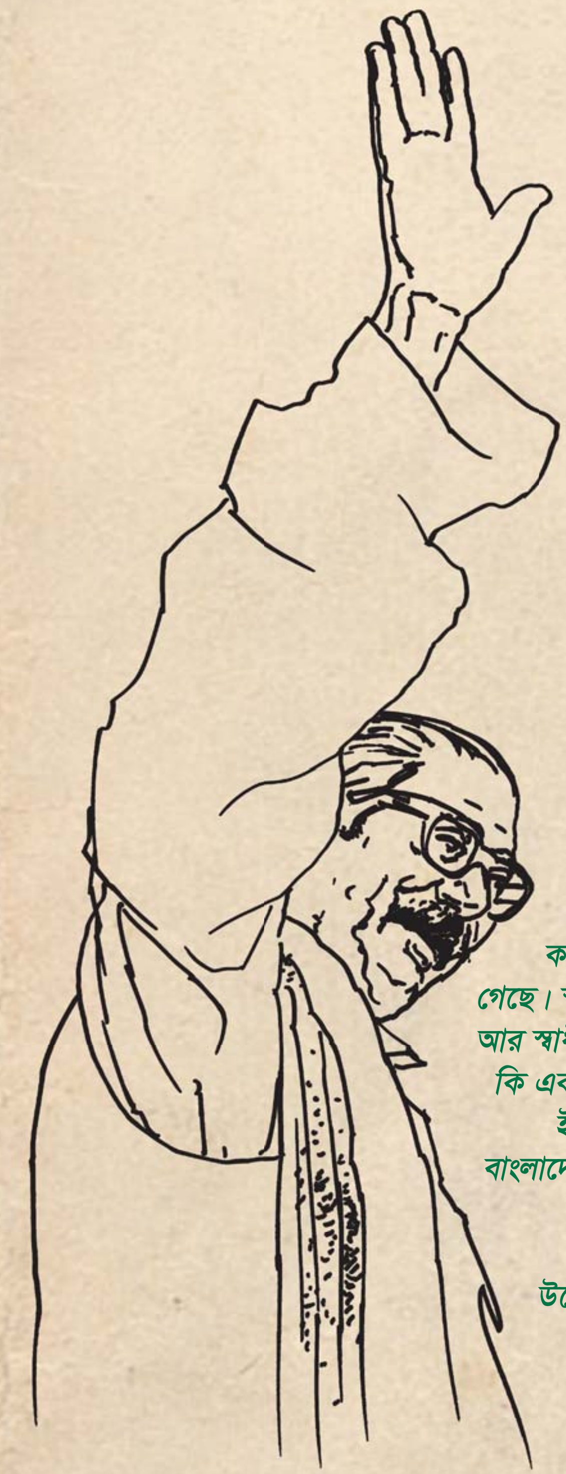

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। আমার বয়স তখন কত হবে। বড় জোর ৯ বছর। ক্লাস ফোরে পড়ি। ভালোভাবে সবকিছু না বুঝলেও মোটামুটি বুঝতে পারি। হাফ প্যান্ট পরি, সাথে হাফ হাতা সার্ট, পায়ে চপ্পল। স্কুলে গেছি। কে যেন বলল, শেখ মুজিব বক্তৃতা দিবেন। কিন্তু কিভাবে শুনব ? জানিতো ভাষণ দিবেন ঢাকায়। পরে কে যেন বলল, রেডিওতে শোনা যাবে। আমাদের পাশের বাড়ির হাবিবুর রহমান চাচা করাচিতে চাকরি করেন। তখন ছুটিতে তিনি গ্রামের বাড়িতে। আসার সময় সাথে একটি তিন ব্রান্ড রেডিও নিয়ে এসেছেন। দৌড়ে ওনাদের বাড়িতে গেলাম। সবার মধ্যে কেমন জানি উৎকণ্ঠা। কি বলে মুজিব ? কি হয়, কি হয় ? টান টান উত্তেজনা। ভয়, আশংকা। যাক, ভাষণ আরম্ভ হলো। কিছুই শোনা যায় না। খালি চিৎকার চেঁচামেচি। মাঝে মাঝে আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ দরাজ গলায় বলতে শোনা গেল, এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। সবার মধ্যে শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। তরুণেরা বলল, এবার দেশ স্বাধীন হবে। পাকিস্তানিদের শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আর প্রবীণ যারা তারা বললেন, দেশ ভাঙ্গলে সব খান খান হয়ে যাবে। পাক সেনাদের সাথে খালি হাতে যুদ্ধ করবে সেটা কি করে সম্ভব।

রাতে শুয়ে আছি। হঠাৎ গুলির শব্দ। দাদি বললেন, যুদ্ধ লেগে গেছে। সবাই চৌকির তলে শুয়ে পড়লাম। সে অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলাম, যুদ্ধ কী? দাদি বললেন -গোলাগুলি। সব শেষ হয়ে যাবে। সকালে ঘুম থেকে উঠলে লোকজন বলাবলি করছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা সারা দেশে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। যুবকদের মেরে ফেলছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। রাজাকার বাহিনী গঠন হয়েছে। এরা বিভিন্ন তথ্য হানাদারকে পৌঁছে দেয়। গ্রামের কিছু যুবক বর্ডার পার হয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ইতোমধ্যে আমাদের গ্রামে হানাদারদের সহযোগিতা করার জন্য শান্তিবাহিনী গঠিত হয়েছে। মাঝে মাঝে তাদের দু'একটা উর্দু কথাও বলতে শোনা যায়।

একদিন সকালে এক রাজাকার এসে আব্বাকে খবর দিল, আপনাকে মেজর সাহেব দেখা করতে বলেছে। ভয়ে আব্বার গলা শুকিয়ে গেল। যা হোক, আব্বা গোসল করে নাস্তা খেলেন। সাদা পাঞ্জাবি পরলেন, সাদা লুঙ্গি, মাথায় টুপি এবং কাঁধে হাজি রুমাল নিলেন। হাতে ছাতা। তখন শুনলাম, আব্বা নাকি আগেই খবর পাঠিয়েছেন রাজাকার পাঠানোর দরকার নাই। উনি নিজেই দেখা করবেন। সকাল ১০টা হবে। আব্বা যাবার জন্য প্রস্তুত। চাচা বললেন, আমি সাথে যাই। আব্বা বললেন দরকার নাই। আমি একাই যাব। যাবার সময় বললেন, আমি আসি । বড় ছেলে হিসেবে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে খুব শক্ত মনে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন। বাড়িতে আমরা সবাই খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে উৎকণ্ঠায় আছি। ছোটরা বিষয়টি তেমন আঁচ করতে না পারলেও বড়দের অবস্থা দেখে খুব ভয় পেলাম। আব্বা চলে যাওয়ার পর থেকে আম্মা কোরআন শরীফ নিয়ে বসে পড়লেন। দাদির হাতে তসবি। চাচা পায়চারি করছেন। কেউ কারও সাথে কোন কথা বলছেন না। আমিও ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছি না। আব্বা গেছেন সকাল ১০টায়। বিকাল ৪টা বেজে

> *'চারদিক থেকে খবর আসতে শুরু করল দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। স্বজন হারানোর কান্না আর স্বাধীনতার আনন্দ মিলে কি এক অবর্ণনীয় অনুভূতি! ইতোমধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে..... দূর থেকে বেজে উঠেছে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'।*

গেছে, কোন খবর নাই। যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে আসরের আযানের সময় আব্বা ফিরলেন। মেজরের আলাপের মূল বিষয় ছিল, তুমি মুসলিম আমরাও। তুমি পাকিস্তান চাও, আমরাও চাই। হিন্দু স্থানীয়রা আমাদের শত্রু। তারা দেশ দু'ভাগ করে দিতে চায়। তোমাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে। তোমাকে পোস্ট অফিস চালাতে হবে। মুক্তিবাহিনীর খোঁজ পেলে জানাতে হবে। আমরা তোমাকে সব সহযোগিতা দিব। এসব বলে আব্বাকে সালাম দিয়ে মেজর বিদায় দিলেন এবং বললেন, ইউ মে গো নাউ। আব্বা আস্তে আস্তে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসার সময় পিছন ফিরে দেখেন একজন রাজাকার বন্দুক কাঁধে পিছে পিছে আসছে। ভয়ে আব্বার পা আর চলে না। যাক, খানিকটা আসার পর দেখলেন রাজাকারটা আর আসছে না। বাড়ি এসে ডাক্তার চাচা এবং সাদেক চাচার সাথে আলাপ করলেন কি করা যায়। ডাক্তার চাচা বললেন, অসুবিধা কি, পোস্ট অফিস চালাবে। কিন্তু সাদেক চাচা বললেন খবরদার, মুক্তিরা এ খবর পেলে জানে মেরে ফেলবে। আব্বা কিন্তু থেমে থাকেননি, পোস্ট অফিস কিছুদিন লুকিয়ে লুকিয়ে চালিয়েছেন। এ খবর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে চলে গেল। একদিন রাতে দেখি অনেক মুক্তিযোদ্ধা আমাদের বাড়িতে। সাদেক চাচার সাথে কথা বলছেন। আব্বাকে ডেকে তুললেন। আমরা ঘুম থেকে উঠে গেলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের ২/১ জন আমাদের নিকটাত্মীয়। তারা আব্বাকে বললেন, আপনাকে আমাদের সাথে ভারত চলে যেতে হবে। পোস্ট অফিস চালাতে পারবেন না। আব্বা তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলেন। বললেন, দেখ বাবারা- আমি যদি চলে যাই তাহলে তারা বাড়ির অন্যদের মেরে ফেলবে, সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে। আমি কিছুদিন চালাই, পোস্ট অফিস আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে গাড়ি, রিক্সা কিছুই চলবে না। তাই ডাক আনা-নেওয়া হবে না। ২/১ জন মুক্তিযোদ্ধা একমত হলেন, কিন্তু অন্যরা মনে করলেন উনি পাকিস্তানিদের দোসর। যা হোক তারা চলে গেলেন। কিন্তু প্রতি রাতেই একবার করে মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের বাড়িতে আসেন, খাওয়া দাওয়া করেন এবং অপারেশন পরিচালনা করে চলে যান। ওদিকে পাকিস্তানি মেজর শর্ত দিয়েছেন সপ্তাহে একদিন ক্যাম্পে হাজিরা দিতে হবে।

আমরা পাকিস্তান ভারত বর্ডারের কাছাকাছি হওয়ায় প্রতিদিনই যুদ্ধের মাঝে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। কারণ আগরতলা থেকে মিত্রবাহিনীর ছোড়া রকেট সেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে পড়ত হানাদারদের ক্যাম্পে। আর পাকিস্তানিদের ক্যাম্প থেকে ছোড়া রকেট সেলও একইভাবে আমাদের মাথার উপর দিয়ে পড়ত ভারতে। আমরা মাঝে অসহায়ের মতো মাটিতে শুয়ে পড়তাম। শুয়ে শুয়ে দেখতাম রকেট সেল এদিক থেকে ওদিকে শাঁ শাঁ করে চলে যাচ্ছে। শেষের দিকে আমাদের ভয় অনেক কেটে যায়। হঠাৎ মাঝে মাঝে শুনতাম বাজারে কারফিউ দিচ্ছে। এটা কি জিনিস বুঝতাম না।

এ ভাবেই চলছিল যুদ্ধের দিনগুলো। অবশেষে এলো ১৪ই ডিসেম্বর। রাতের বেলা দেখলাম প্রচুর অচেনা লোকের সমাগম। সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী, শিখ সেনা। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। সাদেক চাচা এসে বললেন, আগামীকাল হবে ফাইনাল খেলা। মুক্তিবাহিনীসহ ইন্ডিয়ান আর্মি পাক হানাদারদের কাছাকাছি অবস্থান নিচ্ছে। সারারাত ধরে আমাদের গ্রাম, পাশের গ্রামের সব মানুষজন বাংকার গড়ে প্রস্তুতি নিল শেষ যুদ্ধের।

যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়োল্লাস

১৫ই ডিসেম্বর দুপুরবেলা দেখলাম কয়েকটি হেলিকপ্টার উড়ছে আকাশে। আমরা দুপুরে খাওয়ার জন্য বসেছি। সে মুহূর্তে খবর এলো পাকিস্তানিরা আমাদের গ্রামের দিকে এগুচ্ছে অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে। আমি আমার ছোট ভাইকে কাঁধে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলাম। ইতোমধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে। ২/১ জন পাঞ্জাবির সাথে দেখাও হয়ে গেল। ছোট দেখে তেমন কিছু বলল না। আমরা যখন অন্য গ্রামে যাই তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওখানে শুনলাম পাঞ্জাবিরা আমাদের বাড়ি থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত উভয় পক্ষের প্রচুর গোলাগুলি। এক সময় গোলাগুলির শব্দ অনেকটা কমে গেল। তখন আমি আমার ছোট ভাইবোন নিয়ে ধানক্ষেতের আইল ধরে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। অনেক কষ্টে বাড়িতে পৌঁছলাম। তখন রাত প্রায় ১১টা। কান্নার শব্দ। আব্বা আম্মা আছেন। আরও কয়েকজন লোক। গুলির খোসা যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। আব্বা বললেন, কুলক্ষণ। গভীর রাতে হৃদয়বিদারক কান্নার শব্দ শোনা গেল। কেউ বলছে অনেক লোক মেরে ফেলেছে। কেউ বলছে অনেক সৈন্য মারা গেছে। অন্ধকার রাতে কিছু বোঝা গেল না। সকালের আলো ফুটতে শুরু করলে লোকজন আসতে লাগল। তখন আকাশ থেকে অবিরাম বোমা বর্ষণ হচ্ছে। এর মধ্যে জানা গেল, আমার সাদেক চাচাসহ ৯ জনকে সারি বেঁধে হানাদারেরা এক জায়গায় গুলি করে মেরে রেখে গেছে। আরও ২/১ জায়গায় কিছু কিছু লোককে মেরে ফেলেছে। কিন্তু কবর দেবার মানুষ নাই। সাহসও নাই। কিছুক্ষণ পর একজন খবর নিয়ে এলো পাঞ্জাবিদের ক্যাম্পে মিত্রবাহিনী বোমা মেরে সব শেষ করে দিয়েছে। এটা শুনে লোকজন সাহস করে লাশগুলোর দাফন সম্পন্ন করল। ইতোমধ্যে ১৬ই ডিসেম্বর দুপুর ১২টা বেজে গেছে। লোকজনের মধ্যে হতাশা, ভয় কমতে শুরু করেছে। আকাশ থেকে বোমা ফেলা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়েছে গোলাগুলির শব্দ। আমাদের গ্রামে অনেক পাঞ্জাবির লাশ পড়ে আছে। লোকজন রাগে দুঃখে কেউ কেউ মাটির চাকা, ইটের টুকরা ছুঁড়ে মারছে লাশগুলোর ওপর। কেউ কেউ ক্ষোভে, প্রিয়জন হারানোর বেদনায় তীব্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। পরে গর্ত করে পাঞ্জাবিদের লাশগুলোতে রশি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এসময়ে চারদিক থেকে খবর আসতে শুরু করল দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। স্বজন হারানোর কান্না আর স্বাধীনতার আনন্দ মিলে কি এক অবর্ণনীয় অনুভূতি! ইতোমধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে.....দূর থেকে বেজে উঠেছে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'।

■ *লেখক : মহাব্যবস্থাপক, এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র.কা.*

> এরপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ষোলোই ডিসেম্বর। এই দিন হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হলাম আমরা। লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন হলো আমাদের দেশ।

আমার শৈশব আর ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

দীনময় রোয়াজা

সময়টা উনিশ শ’ একাত্তর। তখন আমি নিতান্ত বালক। গ্রামের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি। বয়স হিসাব করলে নয়-দশ বছর এমনই হবে। বয়সের কারণে তখনকার অনেক ঘটনা মনে না থাকারই কথা। তবে মুক্তিযুদ্ধ বলে কথা, তাই স্বাভাবিকভাবে তখন ঘটে যাওয়া ভয় আর আনন্দের সংমিশ্রণে কিছু ঘটনা, কাহিনী বা গল্প এখনও চোখে ভেসে উঠে যা কখনও বিস্মৃত হওয়ার নয়। এমন একটি সুখকর ঘটনা দিয়ে প্রথমে শুরু করি।

তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি। সারা দেশে আন্দোলন চলছে। একদিন গ্রামের স্কুল থেকে আমরা কয়েকজন ক্ষুদে বিপ্লবী ছাত্র চার মাইল হেঁটে খাগড়াছড়ি হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ‘জয় বাংলা’ মিছিলে যোগ দিলাম। সেদিন দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ধুলা উড়ানো মিছিলটি বাজারের দিকে এগুচ্ছিল। মিছিলের শ্লোগান ছিল ‘জয় বাংলা! জয় বাংলা! আমার নেতা তোমার নেতা- শেখ মুজিব, শেখ মুজিব; ছয় দফা এগারো দফা-মানতে হবে, মানতে হবে’ ইত্যাদি। ঠিক তক্ষুণি মিছিলের বিপরীত থেকে এসডিও সাহেবের গাড়িটি (তিনি তখন গাড়িতে ছিলেন না) দ্রুত বেগে আসছিল। মিছিলের সামনে এসে গাড়িটি থেমে গেল। এক নিমিষেই আমরা সবাই গাড়িটিকে ঘিরে ফেললাম। মিছিলের ছাত্রনেতা নির্দেশ দিলেন - ‘ভাঙ্গো হানাদারের গাড়িটিকে, চূর্ণ করো!’ আর যাবে কোথায়? সবাই হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়ে মেরে গাড়িটির বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। গাড়ির ড্রাইভার কোনরকমে পালিয়ে রক্ষা পেলেন। আমার হাতে একটি ইটের টুকরো

ছিল। এতক্ষণ কোন সুযোগ না পাওয়াতে সেটির সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। দেখলাম গাড়ির একটি বাতি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। আমি কালবিলম্ব না করে সেটির উপর সজোরে ইট ছুঁড়ে মারলাম। বাতিটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। পরমুহূর্তে মিছিলের ঐ সুদর্শন ছাত্রনেতা আনন্দে আমাকে শূন্যে তুলে ফেললেন। সেদিনের ঘটনায় গর্বিত আমি বাড়িতে ফিরে সবার সামনে এই কৃতিত্বের কথা বলে কতই গল্প না করেছিলাম।

কিন্তু আমার এই আনন্দ আর উৎফুল্ল ভাব বেশিদিন থাকেনি। অল্প কিছুদিন যেতে না যেতে পরিস্থিতির অবনতি হলো। দেশ পাক হানাদার বাহিনীর কবলে চলে গেল! শুরু হলো স্বাধীনতার যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ! দেখলাম, দলে দলে নারী, পুরুষ যার যার সাধ্যমতো জিনিসপত্র নিয়ে ভিটে ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শুনলাম, তারা ভারতে গিয়ে শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেবে। বিদায় নেবার সময় আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কত আকুলতা! কত চাপা কান্না! কত ভয়! যারা যাচ্ছে, তারা আবার ফিরে আসতে পারবে কি কিংবা যারা রয়ে যাচ্ছে ফিরে এসে তাদের দেখা পাবে কি?

আমার বাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তিনি ভিটেমাটি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। প্রয়োজনে তিনি ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। ইতোমধ্যে পাকসেনারা এসে খাগড়াছড়ি দখল করে নিয়েছে এবং এখানেই তাদের সদর ক্যাম্প স্থাপন করেছে। তাদের দোসর রাজাকাররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে পাকসেনাদের শাসন জারি করতে লাগল। তারাই পালিয়ে যাওয়া পাহাড়ি-আদিবাসীদের শূন্য ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীদের মনে আতংক সৃষ্টি করল। গ্রামে ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল কোন হিন্দু বাঙালি পাহাড়িদের গ্রামে লুকিয়ে আছে কি না।

আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা সম্প্রদায়। সনাতন বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে আমাদের উপর হানাদার বাহিনী চড়াও হওয়া শুরু করল। ইতোমধ্যে খবর এলো একটি ত্রিপুরা গ্রামে হামলা চালানো হয়েছে।

সেখানে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, গৃহবধূদের অত্যাচার করা হয়েছে, তরুণীদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছে। এই দুঃসংবাদের সাথে একটি স্বস্তির খবরও পেলাম। তা হলো, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের হানাদাররা কোন ক্ষতি করবে না। এটি জানতে পেরে হানাদারদের অত্যাচার, নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে গ্রামের ত্রিপুরা আদিবাসীরা যার যার ঘরে টাঙিয়ে রাখা দেবতা শিব, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শ্রী কৃষ্ণের ছবি নামিয়ে বুদ্ধ ভগবানের ছবি টাঙানো শুরু করল। বুদ্ধ ভগবানের ছবি সংগ্রহ করা তখন কঠিন ছিল কিন্তু তার চেয়েও কঠিন ছিল সে সময়ে যিশু খ্রিস্টের ছবি সংগ্রহ করা।

আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। সেদিনই আমাদের বৈঠকখানায় বাঁশি হাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছবিটি এবং অন্দরে নানান রঙিন কাগজে সুসজ্জিত করে রাখা শ্রী-শ্রী মা লক্ষ্মীদেবী ও বিদ্যাদেবী শ্রী-শ্রী সরস্বতীর ছবি নামিয়ে সেখানে ভগবান বুদ্ধের ছবি ঝোলানো হলো। এ নিয়ে আমার মা পীড়াপীড়ি করলে বাবা মাকে বুঝিয়েছিলেন, বর্তমানে যা দিনকাল চলছে অন্তত পাঞ্জাবিদের জুলুমের হাত থেকে তো কিছুটা রক্ষা পাব। যে ভাবেই হোক, আমাদের বেঁচে থাকাটা বড় প্রয়োজন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হতে হবে তো।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হওয়ার যে গৌরব ও সার্থকতা তা অতি সাধারণ গ্রাম্যবালা আমার মা অনুধাবন করতে না পারলেও পাক বাহিনীর অত্যাচার, নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশলটি বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই মা আর স্বধর্মে অবিচল থাকতে পারেন নি। সেদিন থেকে কিছু সময়ের জন্যে হলেও ত্রিপুরাদের ঘরে ঘরে তাদের ভক্তিপূজা পেয়ে সুপ্রসন্ন হয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছে ভগবান বুদ্ধকে।

মাস কয়েক এভাবে চলে গেল। প্রতিদিন সন্ধ্যে হলে দেখি হয় পূর্বাকাশে, নয় দক্ষিণে, নয়তো পশ্চিমে দিগন্ত জুড়ে আগুনের লাল আভা। সাথে বর্ষাকালে মেঘের গর্জনের মতো গোলাগুলি আর বোমার আওয়াজ! প্রকৃতি থমথমে! সন্ধ্যার অনেক আগেই গরু-মহিষ গোয়ালে বাঁধা হতো, মাঠের লোকেরা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরত এবং সন্ধ্যের পরপরই আমরা রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শুনতাম।

এর পরের একটি ঘটনা আজও আমার খুব মনে পড়ে। খাগড়াছড়িতে পাকবাহিনী আসার পর থেকে বাবা বাজারে যাওয়াটা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন, এক বদমেজাজি পাকসুবেদার না কি হাট-বাজারে, রাস্তায় যাকে সামনে পেত তাকে প্রহার না করে ক্ষান্ত হতো না। গ্রামের অনেকেই তার মার খেয়ে আহত অবস্থায় বাড়িতে ফিরেছে। এসব খবরাখবর জানাজানি হওয়ার পর অনেকের মতো বাবাও হাটে যাওয়ার নাম মুখেই নিতেন না। কিন্তু এভাবে চলবে আর কতদিন ? হাটে না গেলে খাব কী ? বিশেষ করে শুঁটকি ছাড়া তো কোন রান্না তরকারি ভালো হওয়ার কথা নয়। তাই মায়ের রাগারাগিতে অবশেষে বাবা একদিন সেজেগুজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাটের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তখন অগ্রহায়ণের শেষ প্রায়। সকালের হালকা কুয়াশা সরে যাওয়ার পর একটু বেলা করে রওয়ানা দিলাম আমরা। আমি বাবার লম্বা জামার কোণা ধরে তার পিছু পিছু হাঁটছিলাম। আমরা বাজারের প্রায় কাছাকাছি গিয়েছি। এমন সময় হঠাৎ সামনে থেকে একটা খোলা জিপ গাড়ি গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে ধুলাবালির কুণ্ডলি পাকিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেগে চলে গেল। সে গাড়ির চালককে দেখে চিনতে পেরে হাটগামী লোকজন অনেকে 'এইতো চলে গেল পাকনা চুল' বলে অন্যদের ইশারায় দেখিয়ে দিল। যে মানুষটি এর আগে তাকে দেখেনি অথচ তার কীর্তিকলাপ শুনেছে সে-ই মজা করে বলল, তাহলে ইনিই পাকনা চুল সুবেদার?

ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়িটি একটু দূরে গিয়ে ব্রেক কষে আবার পিছনে এসে থামল। গাড়ি থেকে বের হলো ফরসা, লম্বা, চওড়া মহিষের দুই শিংয়ের মতো সাদা গোঁফধারী এক পাঞ্জাবি সেনা। মাথার চুল সবই সাদা এবং কোঁকড়া। এক হাতে টুপি আর অন্য হাতে বড় মরিচার লম্বা বেত। বিকট আওয়াজ তুলে বেত উঁচিয়ে সে সবাইকে আদেশ দিল- 'দাঁড়াও'। তার প্রচণ্ড হুঙ্কারে সবাই ভয়ে কাতর হয়ে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়াল। সে ডান হাতের লাঠিটা শূন্যে কয়েকবার ঘুরিয়ে লাইনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বারকয়েক অ্যাবাউট টার্ন করে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো গোঙ্গাতে শুরু করল। লাইনের সম্মুখভাগ থেকে তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলাম, উঃ আহঃ ওহ্ মা! দেখলাম, বেত্রাঘাত সহ্য করতে না পেরে একে একে সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। পেটাতে পেটাতে লাইন ধরে লোকটি একসময় বাবার সামনে এসে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে বাবা ভয়ে, আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। গোঁফওয়ালা পাঞ্জাবি লোকটি তার লাঠিটা উঁচিয়ে ধরল। হঠাৎ আমার কাছে তাকে এক দৈত্যের মতো মনে হলো। আমি খুব ভয় পেয়ে চিৎকার দিয়ে বাবার পিছন থেকে সামনে এসে বাবাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিলাম। পরক্ষণে দৈত্যটি তার শক্ত হাতে উঁচিয়ে ধরা লাঠিটা আস্তে করে নিচে নামাল। কাঁকড়ার শক্ত সরু পায়ের মতো তার ক'টি আঙ্গুল দিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

আমি আরও আতঙ্কিত হয়ে কাঁদতে লাগলাম। এরপর উর্দুতে কিছু বলে দ্রুত হেঁটে গাড়িতে উঠে পড়ল এবং প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে ধুলা উড়িয়ে চলে গেল। আমার ভয়জনিত কান্নার কারণে বোধ হয় সেদিনকার মতো তার বেত্রাঘাত থেকে বাবা রক্ষা পেয়েছিলেন। তাই তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন প্রায়ই সবাইকে এই ঘটনার কথা শোনাতেন।

এরপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ষোলোই ডিসেম্বর। এই দিন হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হলাম আমরা। লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন হলো আমাদের দেশ। চারিদিকে বিজয়ের উল্লাস! বাবার মতো প্রত্যেকেরই সাধ পূর্ণ হলো,-স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হলাম সবাই। শুনেছি ঐ বদমেজাজি পাকসুবেদার না কি যুদ্ধ চলাকালে ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার সময়টুকু তার ভাগ্যে জোটে নি।

■ *লেখক: যুগ্মপরিচালক, চট্টগ্রাম অফিস*

এসএমই ব্যাংকিং পুরস্কার ও ফাইন্যান্সিং ফেয়ার-২০১৪ অনুষ্ঠিত

এসএমই খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে এ খাতে ক্রমাগতভাবে অর্থায়ন বৃদ্ধির প্রয়াসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ১২-১৩ নভেম্বর ২০১৪ দুইদিন ব্যাপী 'এসএমই ব্যাংকিং পুরস্কার ও ফাইন্যান্সিং ফেয়ার-২০১৪' ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১২ নভেম্বর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে.এম. হাবিব উল্লাহর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, এসএমই উদ্যোক্তা ছাড়াও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই'র সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী।

'সেবা থেকে শুরু করে উৎপাদন খাত তথা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ৭০ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করে এসএমই খাত।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা অর্থনীতির প্রাণশক্তি। সেবা থেকে শুরু করে উৎপাদন খাত তথা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ৭০ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করে এসএমই খাত। এছাড়াও ক্ষুদ্র ঋণে আমাদের বিকাশ ঈর্ষণীয়। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় এসেছে, এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের এই ধরনের যৌথ উদ্যোগ এবং ঋণদানকারী ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। এ সময় অর্থমন্ত্রী পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে নির্ধারিত ক্যাটাগরি ছাড়াও উৎপাদন ও

উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কৃত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতি আহ্বান জানান।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, গত চার বছরে মোট ১৮ লাখ ৩৫ হাজার এসএমই উদ্যোক্তাকে দুই লক্ষ ৬২ হাজার ৩৪০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯০ হাজার নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন। তিনি বলেন, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দরকার এসএমই ব্যাংকিং। বর্তমানে এ কৌশল গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের মোট ঋণের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কৃষকসহ ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কাছে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আজ সহায়ক জামানত (Collateral Securities) এর জন্য যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংক ঋণ পাচ্ছেনা একদিন সে হয়তো বিশ্বখ্যাত বহুজাতিক কোম্পানিতে পরিণত হবে। তিনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশে বিকাশমান এসএমই খাতে অর্থায়নে আরও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন।

অর্থমন্ত্রী, গভর্নর ও অন্যান্য অতিথি ফাইন্যান্সিং ফেয়ারের উদ্বোধন করছেন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এসএমই খাতে অর্থায়নের ফলে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে উল্লেখ করে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের সুদের হার এক অংকে (Single digit) রাখতে ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

এফবিসিসিআই'র সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDGs) বাস্তবায়নে এসএমই খাত মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে.এম. হাবিব উল্লাহ বলেন, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ আমদানি বিকল্প এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনসহ দেশের সকল অঞ্চলে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে এসএমই খাত দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মেলার দ্বিতীয় দিনের প্রথমার্ধে 'ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম' বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে পেপার উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আশ্রাফুল আলম। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচির উল্লেখ করে নারী উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগ গ্রহণের প্রশংসা করেন। এছাড়াও তিনি নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রস্তাবিত স্কিমটিকে সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে একটি কার্যকর স্কিম হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে উল্লেখ করেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত।

মেলায় প্রদর্শিত পণ্য

দিনের দ্বিতীয়ার্ধে 'বাংলাদেশে এসএমই খাতে অর্থায়নে বর্তমান প্রেক্ষিত এবং ভবিষ্যৎ করণীয় ' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ। তিনি বলেন, এসএমইতে যাদের ঋণ দেয়া হয় তাদের খুবই কম সংখ্যক খেলাপি হয়, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও কম। তিনি আরও বলেন, বড় শিল্পকে ঋণ দেয়ার চেয়ে এসএমইতে অর্থায়ন অনেক বেশি নিরাপদ। দ্বিতীয় দিনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম.এ মান্নান। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের যৌথ প্রয়াসকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

এসএমই খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে অবদান রাখার জন্য ১০টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: এসএমই খাতে বর্ষসেরা শ্রেষ্ঠ ব্যাংক - মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবান্ধব ব্যাংক - ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তাবান্ধব ব্যাংক - মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, শ্রেষ্ঠ গ্রামীণ উদ্যোক্তাবান্ধব ব্যাংক - বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ, শ্রেষ্ঠ উৎপাদনশীল খাত উদ্যোক্তাবান্ধব ব্যাংক - ঢাকা ব্যাংক লিঃ, শ্রেষ্ঠ কাঠামোগত ব্যাংক - ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ। এসএমই খাতে বর্ষসেরা শ্রেষ্ঠ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ। এছাড়া শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবান্ধব আর্থিক প্রতিষ্ঠান - ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিঃ, শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তাবান্ধব আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ এবং উৎপাদনশীল খাত উদ্যোক্তাবান্ধব শ্রেষ্ঠ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ পুরস্কার পেয়েছে।

উল্লেখ্য দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ মেলায় ৪২টি ব্যাংক ও ১৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মেলায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন এসএমই ঋণ প্রকল্প প্রদর্শনের পাশাপাশি এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনী, ঋণ বিতরণ, ব্যাংকার-উদ্যোক্তা ঋণ সংযোগকরণ ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এছাড়াও চাকরির পাশাপাশি আমি ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স থেকে ব্যাংকিং ডিপ্লোমা সম্পন্ন করি।

আমরা জানি আপনার শিক্ষাজীবনের একটা অংশ কেটেছে কোলকাতায়, তখনকার কোনো স্মৃতি কি মনে পড়ে ?

আমার কলেজ জীবন কেটেছে কোলকাতায়। আমি থাকতাম কোলকাতার বেকার হোস্টেলে। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও থাকতেন বেকার হোস্টেলে। তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। এর ২৫ বছর পর যখন আমার সাথে বঙ্গবন্ধুর দেখা হয় উনি সাথে সাথে আমাকে চিনতে পারলেন এবং উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই দেখ আমাদের বালক নেতা।' আমাকে দেখতে বয়সের তুলনায় তরুণ লাগত বলে বঙ্গবন্ধু আমাকে বালক নেতা বলে ডাকতেন ও চিনতেন। সেই স্মৃতি আজও আমার মনে অম্লান হয়ে আছে।

আপনার ব্যাংকিং জীবনের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। জীবনের এই বিশেষ দিকটির প্রতি যদি একটু আলোকপাত করতেন...

ছাত্রজীবন থেকেই আমি বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে সক্রিয় ছিলাম। ১৯৭১ সালে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় অবস্থান নিই। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে স্বাধীনতার পক্ষে আমি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগদান করেছি। ১৯৭১ সালে তৎকালীন স্টেট ব্যাংকের কর্মচারীরা স্বাধীন দেশের পক্ষে আন্দোলন করছিলেন। আমি ছিলাম সে মিছিলের পুরোভাগে। আমাদের বাধা দিতে পাকিস্তানি আর্মি অগ্রসর হলে আমরা জয় বাংলা বলে শ্লোগান দিতে থাকি। তখন আমার হাতে ছিল বাংলাদেশের পতাকা। এভাবে পাকিস্তানি মিলিটারির রোষানলে পড়ে যাই আমি। তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিয়ে যায়। আমাকে বলা হয় 'তুমি স্বাধীনতার পক্ষের মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছো, স্বাধীনতার পতাকা ছিল তোমার হাতে, সুতরাং আমাদের কাছ থেকে তোমার নিস্তার নেই।' জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে আমি তাদের হাতে একটা সাসপেক্ট লিস্ট দেখতে পাই। লিস্টের উপরের দিকেই আমার নাম ছিল। আমি বিপদ আঁচ করতে পেরে ওয়াশরুমে যাবার বাহানা করে সেখান থেকে পালিয়ে যাই এবং ঢাকা ত্যাগ করে গ্রামের বাড়ি চলে যাই। সেখানকার থানার অফিসার আমাকে জানান, পাকিস্তানি আর্মি আমাকে ধরতে গ্রামের বাড়িতে আসছে। এরপর দেশে অবস্থান করাটা আমার জন্য নিরাপদ ছিল না বিধায় আমি ভারতে চলে যাই। প্রথমে আগরতলা এবং তারপর কোলকাতায় অবস্থান নিই। সেখানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলীসহ জ্যেষ্ঠ নেতাদের সাথে পরিচয় হয়। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী আমাকে মুজিব নগরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর দেশ স্বাধীন হলে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনরায় যোগদান করি এবং দেশের আর্থিক খাত পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হই। স্বাধীনতার পরে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনর্গঠন কমিটিতে এবং কারেন্সি চালু করার ক্ষেত্রে আমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখি।

আমরা জানি বাংলাদেশ ব্যাংকের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের বহুতল বিশিষ্ট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় আপনার হাতে। সেদিনের কথা কিছু মনে পড়ে ?

১৯৮৪ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের বহুতল বিশিষ্ট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। আমি তখন ডেপুটি গভর্নর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত। ১৯৪৮ সালে মাত্র ২০ জন অফিসার-কর্মচারী নিয়ে এই শাখার যাত্রা শুরু হয়েছিল। কালের পরিক্রমায় কাজের পরিমাণ ও পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছিল বলেই নতুন ভবন নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে আমরা ১৫ তলার ভিত্তিসহ ৬ তলা বিশিষ্ট একটি মূল ভবন এবং ৩ তলার ভিত্তিসহ ৩ তলা বিশিষ্ট একটি সংলগ্নী ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এখানে একটা কথা বলতে চাই, চট্টগ্রাম থেকেই আমার কর্মজীবনের শুরু হয়েছিল। তাই কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই কার্যালয়ের ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার সুযোগ পাওয়াটা আমার জন্য একটি বিশেষ ঘটনা। আমার পুরো চাকরি জীবনের সাথেই এরকম নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা জড়িয়ে আছে।

আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই -

আমার স্ত্রী আতিয়া ফারহাত বেগম– যে আমার সুখ-দুঃখের সাথী। চার ছেলে– বখতিয়ার খালিদ, শাহরিয়ার খালিদ, ইফতেখার খালিদ, জুলফি-কার খালিদ এবং একমাত্র কন্যা সারওয়াত খালিদ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বয়সের হিসাবটা বড় হয়ে ওঠে। এই দীর্ঘ সময় যে সুস্থভাবে পার করছি এজন্য শুকরিয়া জানাই মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে। শেষ বয়সে ছেলেমেয়ের উপস্থিতিটা বড় পাওয়া মনে হয়। আমি শুধু আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি সবাইকে যেন তিনি শান্তিপূর্ণ জীবন দান করেন।

'আমার পরিবার। সবাইকে যেন মহান সৃষ্টিকর্তা শান্তিপূর্ণ জীবন দান করেন'- এম. খালিদ খান

সবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন-

আমাদের মতো অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকার তাঁদের শ্রম, মেধা ও দক্ষতা দিয়ে নানাভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্মাণ করেছেন। আমরা যেন তাঁদের অবদান ভুলে না যাই। বাংলাদেশ ব্যাংকের যা কিছু সাফল্য তা সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা হিসেবে গর্ববোধ করি। আমি আশা করি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক উন্নতির জন্য সবাই একসাথে কাজ করবেন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের একজন অসমসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের কমান্ডার ও কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের যুগ্ম মহাসচিব (প্রশাসন) এবং বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাপতি পদে দায়িত্বরত আছেন। এ সাক্ষাৎকারে তিনি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আপনার শৈশব কোথায় কেটেছে ?

আমার শৈশব কেটেছে টাঙ্গাইলে গ্রামের বাড়িতে। নদী-পুকুরে সাঁতার কাটা, গাছে ওঠা, ফল চুরি করা, উঁচু গাছে দোলনা বেঁধে দোলা এবং সেখান থেকে আষাঢ়ের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া, অতি বৃষ্টির রাতে মাছ ধরা ইত্যাদি ছিল নিত্যদিনের কর্মসূচি। বাবা মা'র কঠিন শাসন থাকলেও আমি ও আমার বড় ভাই মোঃ লুৎফর রহমান খান পলাশ ছিলাম খুবই সাহসী ও দুরন্ত। এমন দিন নেই যেদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে দু'চারটা দুষ্টুমির বিচার আসত না। ফুটবল, ভলিবল, সাঁতার ও সাইক্লিং ও সঙ্গীতে আমরা পারদর্শী ছিলাম। গ্রাম ও সারা থানা জুড়েই নিজেদের খেলাসহ কন্ট্রাক্ট খেলা খেলতে যেতাম। এভাবেই গ্রাম বাংলার মাটি, মানুষ ও সংস্কৃতির সাথে একাকার হয়ে যাওয়া। সে সূত্রেই ৭১ এর ক্রান্তিলগ্নে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

কোন চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ?

দেশের প্রতি ভালোবাসা, স্বাধীনতার চেতনা, বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি দৃঢ়তা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও আহবানই আমাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে সময়ে অর্থাৎ ১৯৭১ সালে দেশে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ছিল এবং অন্তত তার দুই কোটি ছিল যুবক। তাদের বয়স ছিল যুদ্ধে যাওয়ার মতো, কিন্তু তারা সকলে যুদ্ধে যায়নি। দেশ স্বাধীন হবে তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি কিংবা জীবন বাজি রাখতে সাহস করেনি। জানা মতে রাজনৈতিক পরিবার ছাড়া বনেদি পরিবারের সন্তানেরা মুক্তিযুদ্ধে তেমনভাবে অংশগ্রহণ করেনি।

আমার জন্ম টাঙ্গাইলে বাশাইল থানার অন্তর্গত হাবলা (শাপলা) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম গৃহস্থ পরিবারে। আমার বাবা মরহুম হায়দার আলী খান ও মাতা মরহুমা রাবেয়া খাতুন তারা। বাবা ছিলেন দূরদর্শী চিন্তার রাজনীতি সচেতন একজন জ্ঞানী মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তার ধ্যান, জ্ঞান ও আদর্শ। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কেও তিনি ভালো জ্ঞান রাখতেন।

রাজনীতির প্রতি আমাদের সকলের আগ্রহ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছিলেন এলাকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ও মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন ন্যায়নিষ্ঠ একজন মানুষ। আমার মা'ও ছিলেন খুব সাহসী এবং নীতিবান মানুষ।

৭ম শ্রেণিতে জামুকী বহুমুখী নওয়াব আব্দুল গণি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায়ই বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান খান তালুকদার (খোকা ভাই), হামিদ ভাই, বেলায়েত ভাই ও জুমারত ভাইয়ের (সাঁটিয়া চূড়ার যুদ্ধে শহীদ) বক্তব্য ও তাদের সান্নিধ্যে লেখাপড়ার পাশাপাশি রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ি।

সে সময় আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মরহুম জিয়ারত আলী খান। তিনি তৎকালীন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজিতে এমএ ডিগ্রিপ্রাপ্ত। তাঁর মতো আদর্শবান, ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানী শিক্ষক সে সময়ে সারা দেশে দ্বিতীয়টি ছিল না। তিনি একাধারে ছিলেন সাহসী, প্রজ্ঞাবান ও পণ্ডিত ব্যক্তি। স্কুলে তিনি লেখাপড়া, খেলাধুলার পাশাপাশি রাজনীতির চর্চা করার স্বাধীনতা দিতেন। বঙ্গবন্ধুর বিশেষ বিশেষ সভা সেমিনারে আমরা বড় ভাইদের নেতৃত্বে ট্রাকে করে শ্লোগান দিতে দিতে ঢাকায় যেতাম। এজন্য জিয়ারত স্যার কোন বাধা দিতেন না।

এভাবেই স্কুলে আমার লেখাপড়া ও রাজনীতি একই সাথে চলতে থাকে। আমি নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন শুরু হয় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন। বাংলার সচেতন তরুণ ছাত্রদের সাথে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়ি আন্দোলনে। সা'দত কলেজের ছাত্রনেতা বাতেন ভাইসহ অন্যদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে থাকি। '৭০ এর গণ জোয়ারে সারা বাংলা তখন আন্দোলিত, মুক্তির নেশায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সে সময় উন্মাতাল। এভাবেই বাংলায় আসে ৭১ সাল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের পর গণমানুষের স্বাধীনতার দাবি আরো জোরদার হতে থাকে।

যখন আমরা বাঙালিরা ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে অর্থাৎ ৭০ এর নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে প্রস্তুত; তখনই ইয়াহিয়া-ভুট্টো কৌশলে সংসদ অধিবেশন আহবান না করে ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি নিধনযজ্ঞে নেমে পড়ে। হায়েনারা মনে করেছিল হয়তো এ হত্যাযজ্ঞে বাঙালি নিশ্চুপ ও চিরতরে পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক দিক নির্দেশনামূলক ভাষণের পর বাঙালি জাতি তাদের প্রতিরোধ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। তাই আমরা সচেতন যুবক-কিশোররা যে যেভাবে পারি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য বন্ধু-বান্ধব মিলে রাতে পরিকল্পনা গ্রহণ করি এবং এর প্রস্তুতি হিসেবে দুঃসাহসিক কিছু ঘটনাও ঘটিয়েছি যেগুলো মনে হলে আজও শিহরিত হই।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত কোন ঘটনা বলুন যা আজও আপনাকে নাড়া দেয়-

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ৭১ এ অনেক ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন চালিয়েছি। তবে কিছু ঘটনা মনে হলে এখনো অশ্রুসিক্ত হই। ২৬ মার্চ থেকে ঢাকার অনেক মানুষকে দেখেছি কষ্ট করে গরুর গাড়িতে করে গ্রামে ফিরতে। খেয়ে না খেয়ে কত কষ্টই না করেছে মানুষগুলো। তাদের মুখে কোন ভাষা ছিল না, কি যেন অজানা আতংক তাড়া করছিল তাদের। দেখেছি বৃদ্ধা মাকে নিয়ে ছেলেরা কী কষ্ট করে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছে।

সে দৃশ্য ছিল মর্মস্পর্শী। এমনি এক মাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় বয়স্ক মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। উপস্থিত দুই ছেলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। আমি বেগতিক অবস্থা দেখে দৌড়ে একটি বাড়িতে ঢুকে কুয়া থেকে মাটির কলসিতে এক কলস পানি এনে দেই তাদের। তারপর আর দাঁড়াতে পারিনি, চলে গেছি নিজ গন্তব্যে। এরকম কত হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য আজও চোখে ভাসে, নাড়া দেয় মনকে।

প্রজন্ম কমান্ড/ সন্তান কমান্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজন্ম কমান্ড প্রতিষ্ঠায় আপনার ভূমিকা ও উদ্দেশ্য কি ছিল ?

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ধরে রাখার জন্য সন্তান বা প্রজন্ম কমান্ড দরকার বলে ২০০১ সালে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের নির্দেশে সন্তান কমান্ড গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে সংগঠনটির শাখা-প্রশাখা জেলা ও উপজেলায় বিস্তৃত করা হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমান্ডের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী আমাকে নির্বাচিত সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দেশের সকল সংগঠন বিশেষ করে যুব কমান্ড, ছাত্র কমান্ড, সন্তান কমান্ড, মহিলা কমান্ডসহ সার্বিক বিষয় দেখভালের দায়িত্ব প্রদান করেন। আমি দায়িত্ব নিয়ে যথাযথভাবে কাজ শুরু করি। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমান্ডের নির্বাচনের পর ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় এসে আমাদের জয়বাংলা শ্লোগানধারীদের বহিষ্কার করে, তালা ভেঙে কেন্দ্রীয় কমান্ড দখল করে নেয়া হয়। আমরা নির্বাচিত ১৫ জন 'জয়বাংলা শ্লোগানধারী' তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে ২৭ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আমাদের কেন্দ্রীয় কমান্ড প্রতিষ্ঠা করে প্রায় সাতবছর ধরে পরিচালনা করি। এ সময়ে সন্তান কমান্ডের সাথে প্রজন্ম কমান্ডেরও জন্ম হয়।

'যে কেউ ইচ্ছে করলেই মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেনা' - মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব

আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে প্রায় দশ বছর আগে প্রজন্ম কমান্ড গঠন করেছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী কর্মীদের এ সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অটুট রাখার জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড ও প্রজন্ম কমান্ড মিলে ব্যাংকে জাতীয় দিবসগুলো উদ্‌যাপন, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও রায় কার্যকর করার জন্য চাপ সৃষ্টিসহ অন্যান্য বিষয়ে কাজ করছে।

এছাড়া আমি নিজে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং সেক্টরে চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আসছি। বাংলাদেশ ব্যাংক একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার চেতনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া হবে বা মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা কাজ করবে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমানও ব্যাংকিং সেক্টরের উন্নয়নসহ জাতির জনকের স্বপ্ন তথা মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটি সংস্কারে আপনাদের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি শহীদ মিনার রয়েছে। এ স্মৃতিস্তম্ভে আমরা বিভিন্ন সংগঠন শহীদ দিবস, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসে এই ব্যাংকের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাসহ জাতীয় বীরদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে পুষ্পমাল্য অর্পণ করি। বর্তমান গভর্নরের নির্দেশে একটি আধুনিক ও বড় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ব্যাপারে একটি কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। এই কমিটির সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। আমি এ কমিটির সদস্য হিসেবে সভাপতির সঙ্গে কাজ করছি। ইতোমধ্যে গভর্নর জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দেশের স্বনামধন্য স্থপতিদের কাছ থেকে নকশা সংগ্রহের কাজ চলছে। আশা করছি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, স্মরণযোগ্য শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের কাজ শেষ করে যেতে পারব ইনশা আল্লাহ।

স্বাধীনতার এত বছর পরে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে আপনার অনুভূতি কী ?

মুক্তিযুদ্ধ আমার কাছে অতি গর্বের ও অহংকারের বিষয়। যে কেউ ইচ্ছে করলেই মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেনা। আমি সে সময়ে দশম শ্রেণির ছাত্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি। জীবনে অনেক কিছুই পাইনি বা পাব না, তাতে আক্ষেপ নেই। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখতে পেরেছি এটাই আমার কাছে অতি গর্বের ও আনন্দের। আমি তো সে সময় কোন চুক্তি করে মুক্তিযুদ্ধে যাইনি যে আমাকে এখন তা দিতে হবে। এ বিষয়ে হয়তো অনেক মুক্তিযোদ্ধাই আমার সাথে একমত হবেন না। আমি কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের একজন নির্বাচিত যুগ্ম মহাসচিব। এজন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে অনেক বিষয়ে দাবি আদায়ে সোচ্চার হতে হয়। তখন কিছুটা দ্বিধান্বিত থাকি কিন্তু করার কিছুই থাকেনা।

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিতে ক্ষেত্রবিশেষে লজ্জাবোধ করি। অনেক কষ্ট হয়, ক্ষুব্ধ হই যখন দেখি স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতায় যায়, স্বীকৃত স্বাধীনতা বিরোধীদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা শোভা পায়। আবার কিছু অমুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নাম লিখিয়ে জাতীয় বীরদের সম্মানহানি করে। তাদেরকে ধিক্কার জানাই। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মর্যাদা তারা ক্ষুণ্ন করেছে। বর্তমান মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব:) হেলাল মোর্শেদ খানের সহযোগিতায় জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্বচ্ছ তালিকা করার চেষ্টা করছেন। আমি কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের যুগ্ম মহাসচিব (প্রশাসন) হিসেবে সে কাজে সহযোগিতা করছি। আমাদের সকলের সহযোগিতায় একটি স্বচ্ছ তালিকা প্রণয়ন হলে আমরা আবার গর্বভরে কথা বলতে পারব। বলা যাবে এ দেশ, এ জাতি, এর আলো-বাতাস, জাতীয় পতাকা এবং আজকের এই উন্নত রাষ্ট্রীয় জীবন সবকিছুই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

অবসর

মোঃ লুৎফুল কবির
(মহাব্যবস্থাপক)

ব্যাংকে যোগদান: ১৬/৬/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি: ২৯/১০/২০১৪
বিভাগ: সিআইবি

মোঃ আসাদুজ্জামান খান
(উপমহাব্যবস্থাপক)

ব্যাংকে যোগদান: ১১/১১/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি: ১/৯/২০১৪
বিভাগ: ডিবিআই-২

মোঃ শাহ্জাহান নূরী
(উপমহাব্যবস্থাপক)

ব্যাংকে যোগদান: ২৩/৯/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি: ৩১/১০/২০১৪
বিভাগ: আইন বিভাগ

সুশীল কুমার ঘোষ
(যুগ্মপরিচালক)

ব্যাংকে যোগদান: ১৬/৮/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি: ১৮/৯/২০১৪
বিভাগ: ডিবিআই-২

মেধাবী মুখ

ফাতেমাতুজ জোহরা জলি

ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা হতে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ (একাউন্টিং) অর্জন করেছে। ফাতেমাতুজ জোহরা জলি বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের উপব্যবস্থাপক (ক্যাশ বিভাগ) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. ফিরোজ মিয়া ও জাহানারা খানমের কন্যা।

২০১৪ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ মাহিন হোসেন
ঢাকা কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাম্মৎ হোসনেয়ারা (ডিডি, ডিওএস, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ মোবারক হোসেন (জেডি, এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র.কা.)

সাদি সাকলায়েন মেহসান
নটরডেম কলেজ

মাতা: শাহনাজ বেগম
পিতা: জি এম ছফেদ আলি (এডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.)

সুমাইয়া তাসনিম
ঢাকা সিটি কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শামিম আরা খানম
পিতা: মোঃ আব্দুল জব্বার (ডিএম, মতিঝিল অফিস)

সাদিয়া সিলভী
শামছুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ কানিজ ফাতেমা
পিতা: শেখ মোহাঃ আশফাকুল ইসলাম (ডিডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

মোছাঃ মায়িশা ফারজানা (মিতু)
সরকারি আযিযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ নার্গিস সুলতানা
পিতা: মোঃ মোজাম্মেল হক (এএম, বগুড়া অফিস)

রুবাইয়াত মায়িশা আঁচল
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাজমুন নাহার
পিতা: জহিরুল ইসলাম (এএম, সদরঘাট অফিস)

তাহসিনা রহমান (সুমি)
শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ (মানবিক বিভাগ)

মাতা: রাশিদা রহমান
পিতা: মোঃ আতিকুর রহমান (জেডি, বরিশাল অফিস)

শাদমান শাহরিয়ার
বীর শ্রেষ্ঠ নূর মুহাম্মদ পাবলিক কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রফিকুন নেছা (ঝর্ণা)
পিতা: মোঃ সাইরুল ইসলাম (ডিএম, সদরঘাট অফিস)

আফসানা রহমান (মিমি)
শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রাশিদা রহমান
পিতা: মোঃ আতিকুর রহমান (জেডি, বরিশাল অফিস)

অভিজিৎ সেন
খুলনা পাবলিক কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রীতা রানী সেন
পিতা: অশোক কুমার সেন (ডিডি, খুলনা অফিস)

ফারজানা আলম
সরকারি আযিযুল হক কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নুরূন নাহার
পিতা: মোঃ শামছুল আলম (ডিএম, বগুড়া অফিস)

সিরাজাম মুনিরা
তামিরুল মিল্লাত (মহিলা) কামিল মাদ্রাসা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নার্গীস পারভীন
পিতা: হাফেজ মোঃ আব্দুল বারিক (সিটি, মতিঝিল অফিস)

শিল্পী হাশেম খান (জন্ম-১৯৪২)

অধ্যয়ন করেছেন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস, ঢাকা, ১৯৬১। রিসার্চ স্কলার হিসেবে সিরামিক বিষয়ে অধ্যয়ন ১৯৬৩ সালে। টোকিওর এসিসিইউ (ACCU) তে স্বল্পকালীন বই নকশা ও ইলাস্ট্রেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ১৯৭৯। চিত্রকলায় অবদানের জন্য একুশে পদক ১৯৯২, স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১। দীর্ঘ ৪৪ বছর শিক্ষকতায় কর্মরত ছিলেন ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস ও চারুকলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কাজের মাধ্যম তেলরঙ, জলরঙ, অ্যাক্রেলিক, কালিকলম। বর্তমানে চিত্রশিল্পী হিসেবে কর্মরত। লেখালেখির জগতেও পরিচিত ব্যক্তিত্ব। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৬। বাংলাদেশে শিশু-চিত্রাঙ্কনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক, বই-নকশা ও শিশু পুস্তক অঙ্কনে খ্যাতিমান চিত্রী। ১৬ বার জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র থেকে পুরস্কার পেয়েছেন বই নকশা ও ছবি আঁকার জন্য। বাংলাদেশের সংবিধান গ্রন্থের প্রধান শিল্পী।

চিত্রকর্ম : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণ

শিল্পী হাশেম খান অঙ্কিত ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ, ১৯৭১ এর ভাষণ’ চিত্রকর্মটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহে রয়েছে। ইতিহাস নির্ভর ব্যতিক্রমী এই চিত্রকর্মটি বাংলাদেশ ব্যাংকের শিল্পকর্ম সংগ্রহে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। ব্যাংকের প্রধান ভবনের চতুর্থ তলায় প্রবেশ করলেই করিডোরে স্থাপিত এই বিশাল চিত্রকর্মটি সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক এক ভাষণ দেন। ঐ জনসভায় বিপুলসংখ্যক লোক একত্রিত হয়, সেই দৃশ্য আমরা বিভিন্ন আলোকচিত্রে দেখতে পাই। শিল্পী হাশেম খান সেই দৃশ্য আঁকেননি, তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অন্তর্নিহিত শক্তিকে এঁকেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর যে উদাত্ত আহ্বান পৌঁছেছিল সেই উদ্দীপনা আর সাহসকে আঁকতে চেষ্টা করেছেন। শিল্পী তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চিত্রকর্মটিতে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার অংশ তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন.....

“ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল,
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে”
“রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্”
....
“বীর বাঙালী অস্ত্র ধর
বাংলাদেশ স্বাধীন কর”

সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিকৃতি বলতে আমরা যা বুঝি সেই বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোন প্রতিকৃতি চিত্রকর্মে নেই। তবে শিল্পী হাশেম খান চিত্রকর্মটি এমনভাবে এঁকেছেন যে ক্যানভাসের প্রতিটি রেখায়, রংয়ের ব্যবহারে, উক্তিতে বঙ্গবন্ধুর অবয়ব প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আছেন চিত্রকর্মটির সর্বত্র, মানুষের মনের ভিতর সেদিনের যে ছবি রয়েছে তার জন্য বঙ্গবন্ধুকে আলাদা করে আঁকার প্রয়োজন নেই বলে শিল্পী মনে করেন।

তিনি পোস্টার পেইন্টিং না করে ক্রিয়েটিভ পেইন্টিং করেছেন। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাষণের শক্তিশালী দিকটিই তাঁর চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে। শিল্পী মনে করেন, সারা পৃথিবীতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষণ। তিনি শৈল্পিক দিক থেকে চিন্তাভাবনা করে মাত্র কয়েকটি রেখা আর দু'টি রঙ ব্যবহার করেছেন এই চিত্রকর্মে। চিত্রকর্মটিতে বাংলাদেশের মানচিত্র, সাধারণ মানুষের অবয়ব, প্রতিরোধ আর মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সুস্পষ্ট।

শিল্পী হাশেম খান ২০০৬ সালে এ ধরনের একটি ছবি এঁকেছিলেন, যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। ২০১০ সালে আঁকা ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণ’ চিত্রকর্মটি বাংলাদেশ ব্যাংক সংগ্রহ করায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। শিল্পী হাশেম খান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বড় ভাইকে হারিয়েছেন। তাঁকেও পাকিস্তানি দোসররা গুলি করেছিল, সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। শিল্পী হাশেম খান দেশ ও মুক্তিযুদ্ধের ছবি এঁকে চলেছেন, আজীবন আঁকবেন। শিল্পীর হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এখনও অমলিন-এখনও বিজয়ের মাসে মনের মাঝে তার অনুরণন....

“এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা”

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণ। মাধ্যম : অ্যাক্রেলিক ২১৪ x ৩৬৬ সে:মি:

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।